কুঁড়োজালি

আব্দুল মতলেব

এক তাড়া কুঁড়োজালি বগলে নিয়ে একটু চিন্তিত হল নাজিরা। পাশাপাশি তিনটি পুকুর, একটা পদ্ম ফুলে আর পানায় ভরা, বড়ো; মাঝেরটা পানিফল, জলদাম আর সাদা নীল কলমি ফুলে ঢাকা; আর একটা শাপলায়, ফুল - পানায় ছাওয়া। মাঝের পুকুরটার মধ্যিখানটা ফাঁকা, কাজল কালো জল, তিরতির করছে ঢেউ। কেমন যেন গা শিরশির করে ওঠে। পুকুরটার গভীরে কেমন যেন অপার রহস্যময়তা। পদ্মপুকুরের জল পানসে দুধের মতো।

কোন পুকুরের কুঁড়োজালি পাতবে ঠিক করতে পারে না নাজিরা। কোন পুকুরের কুঁড়োজালি পাতলে কুটো চুনোপুঁটি পড়বে তা ভেবে পাচ্ছে না। ভাই নাসির নাজিরার মুখের দিকে চেয়ে তার ভাবগতিক বোঝার চেষ্টা করে। তার এক হাতে চার, আর এক হাতে মাটির ছোটো কলসি, মাছ রাখার জন্য। মাটির হাঁড়ির গলায় দড়ি বাঁধা।

নাজিরাকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, কীরে বুবু, দাঁড়ালি কেনে? কুন পুকুরের পাতবি, চ।

নাজিরা তার কথার কোনো জবাব দিল না। তিনটি পুকুরের দিকে চেয়ে তিনটি আঙুল বাড়িয়ে বলল, ধর তো নাসু একটা আঙুল।

নাসির কোনো কিছু চিন্তা না করে মাঝের আঙুলটা ধরল। নাজিরা বলল, চ, হয়িছে। শেখেদের পুকুরে পাতি গে। মাছ পড়লি ভালো, লইলি অন্য পুকুরে যাব।

দুই ভাইবোনে শেখেদের পুকুরের দক্ষিণপাড়ে এসে আমগাছের নীচে তাদের কুঁড়োজালিগুলোতে কুঁড়ো, খোল আর খুদ গুঁজোভাজা দিয়ে দিয়ে রাখতে লাগল। তখনও চারটা গরম আছে আর সুন্দর ম ম করা গন্ধ ছাড়ছে।

— যা গন্ধ ছাড়ছে না বুবু, চিংড়ি দাঁড়কি পুঁটি ছুটি আসবে।

নাজিরা তার কথার কোনো জবাব দিল না। বলল, এগুলো নিয়ে আয়, একটি একটি করে আমাকে দিবি, আমি পেতি পেতি দুব।

একটা হাতে করে নিয়ে গিয়ে হাঁটুজলে নেমে পেতে দিল। শুকনো কুঁড়োজালি প্রথমে ভেসে রইল। কুড়োগুলো ভাসতে লাগল। নাজিরা কুঁড়োজালিটা হাতে করে ডুবিয়ে দিল। তারপর পাততে লাগল পর পর। নাসির একটা একটা করে ধরিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছিল ডাঙা থেকে। নাজিরা হাঁটু অব্দি ফ্রকটা কোমর পর্যন্ত গুটিয়ে বেঁধে নিয়েছে। পরনে তার প্যান্টি।

পুকুরের চারিদিকে কুড়িখানা কুঁড়োজালি দুই ভাইবোনে পেতে দিল।

পুরোনো ছেঁড়া পাতলা কাপড়, মশারি ছেঁড়া, একহাত - দেড়হাত মাপে কেটে ওই মাপের সরকাঠি বা সরু শুকনো কঞ্চি চার কোণে বেঁধে গুণিত চিহ্নের আকারে পেতে দিয়ে রাঢ় গ্রামবাংলার দরিদ্র মানুষজন শরৎকালের প্রাকসন্ধ্যা মুহূর্তে চুনো মাছ ধরে। এই মাছ ধরার বয়স্কদের চেয়ে কিশোর - কিশোরীদের উৎসাহ বেশি। এই কুঁড়োজালি গ্রামবাংলায় কুচোমাছ ধরার এক ধরনের ফাঁদ।

কুড়োজালি পেতে দুই ভাইবোনে একটা আমগাছের মাটির উপর জেগে থাকা লম্বা শিকড়ে এসে বসে। নাসির বসল ঘোড়ার উপর সওয়ারি হওয়ার মতো করে। দৃষ্টি কুঁড়োজালির দিকে।

—বুবু, মেলায় মাছ পড়লি পাড়ায় বিক্রি করি চাল কিনব, আলু কিনব বেশ। আজ ভাত খাব। রোজ রোজ নুন দিয়ে কি যাউ খেতি ভালো লাগে? তুর ভালো লাগে খেতি? লাগে না বল?

—লাগে, ভালোই তো। নুন দি যাউ, কুনোদিন কচু, পুই, ঝিঙে, ঢাঁড়শও তো থাকে। যেদিন যিটা পাই আমি তো তাই খাই। ভালো আমরা কুথা পাব বল? আমরা গরিব না। আমাদের ভালো খেতি নাই।

নাজিরার গলা ধরে আসে। এই চোদ্দো বছরের জীবনে অভাব - অনটন-খিদের কামড় কী, তা এই জীবনের ভালোই জানা হয়ে গেছে। আট বছরের ভাইটা সেসব বোঝে কিন্তু গভীরে যায় না। কোথা থেকে খাবার জোগাড় হয়, কীভাবে হয়, ও কী জানবে? জানাতেও চায় না নাজিরা।

— তুই ওসব চুরি করিস বুবু?

—নারে, চুরি করব কেনে? লোকে দেয়?

—এমনি এমনি দেয়? কেনে দেয়? চাল দেয় না কেনে? আমরা কুনোদিন ভাত খেতি পাব না?

নাজিরার বুকের ভেতরটা হু হু করে। চাট্টি ভাত, গরম ভাত, পদ্মাফুলের মতো ভাত। ভাইটা ক-দিন ভাত পায়নি। কোনোদিন শুধু নুন দেওয়া খুদের যাউ, কোনোদিন হয়তো বা একটু তরকারি পায়। তাই খেয়েই থাকে। ভাইটা সব বুঝে গেছে। প্রথম প্রথম ভাতের জন্য খুনখুন করত। তখন বলতে হত, আব্বা চাল আনতে গেইচে, আসুক ভাত খাবি।

ভাইটার জন্য নাজিরা এখান-ওখান থেকে শশা না হয় কাঁচা তেতুল নিয়ে আসে। কখনো পুঁই, কুচ-ঢ্যাঁড়শ। মা শুধোয় —

ইসব কুথা থেকি পেলি? লোকের ভুঁই থেকি চুরি করি তুলি আনিসনি তো?

—না মা, চাইলাম, ওরা দিলি।

—এমনি এমনি দিলি?

মায়ের মন সন্দিগ্ধ হয়। মেয়ে অভাবের সংসারেও কেমন আগাছার মতো বাড়ছে। তবু কিছু বলে না। তাদের অভাবের সংসারে যা হোক কিচু আনছে তো! পোড়া পেট যে। জ্বলুনি বেশি। আনিসা চুপ করে মেয়েকে দেখে, আর চিন্তান্বিত হয়। মেয়ে তার যেরকম বারবেড়ানি, তাতে কখন কী হয়ে যাবে কে জানে! দিনকাল তো ভালো নয়। মেয়ের স্বাস্থ্য, ছিরি, পরিবর্তন দেখে আর শঙ্কিত হয়।

বাড়ির লোকটা সাতদিন হল দক্ষিণের আত্মীয়দের বাড়ি গেছে কিছু সাহায্যের আশায়। তাদের অবস্থা ভালো। তবু এই ভাদ্র - আশ্বিন মাসটা সব সংসারেই এখন টানাটানি। তারা যদি কিছু না দেয়...। আনিসা ভাবতে পারে না। মাথাটা ঝিমঝিম করে। মেয়েটা কোথা ছিল এসে বলল, মা ছেঁড়া কাপড়, মশারি থাকে তো দাও, কুঁড়োজালি করব, পেতে মাছ ধরব।

নাজিরা সব ঠিকঠাক করে ভাইটাকে নিয়ে গেল চুনোমাছ ধরতে। যদি বেশি মাছ হয়, তো বিক্রি করে চাল কিনে ভাত রান্না করে দেবে। মেয়েটা যেন তার ছেলের কাজ করছে। খাবারের জোগাড় করছে বলে তারা চারটি খেতে পাচ্ছে। বেঁচে আছে।

—চল এবার ঝাড়ি গো।

দুই ভাইবোনে কুঁড়োজালি ঝেড়ে নিরাশ হল। কিছুই মাছ তেমন পড়েনি। প্রায় কুঁড়োজালির কাছেই ভাসা কুঁড়োগুলো নিয়ে পুঁটি দাঁড়কি মাছগুলো ঠুকরে ঠুকরে। আবার পেতে দিল।

নাজির বলল, আউশ ধানের থোড় খাই গে চল।

নাজিরা আর নাসির কাছের আউস জমির আলে এল। তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য কমলা রং নিয়েছে। কাঁচ-থোড় জমিতে সূর্যের রূপোলি আভা, আর তাদের দুই ভাইবোনের দীর্ঘ ছায়া।

নাজির ধানের কাঁচা-থোড় টেনে টেনে বের করে পাতা ফাঁক করে ধানের কচি ভ্রূণ বের করে ভাইকে দিয়ে বলল, নে খা, চিবিন খা, দেখবি দুধের মতুন খেতি। আমিও রোজ খাই। যখুন ভোখ লাগে, মাঠে এসে খাই।

চিবিয়ে খেতে খেতে নাসির বলল, ইঃ! দারুণ খেতি রে বুবু।

নাজিরা ধানের শিষ ভ্রূণ খেতে খেতে বলল, তুই ইবার নিজে তুলি তুলি খা।

ধানের কাঁচ-থোড়, শিষ ভ্রূণ খেয়ে ওরা আবার এসে কুঁড়োজালি ঝাড়তে লাগল। এবারও তেমন কিছু পড়েনি। চিন্তিত নাজিরা ভ্রূ কুঁচকে বলল, তাই তো রে, মাছ তো পড়চি না। জামপুকুরে গে পাতি চল। দু খেপ দেখবু, না পড়লি লতুন পুকুরে যাব, কী বলিস?

নিরাশ কণ্ঠে নাসির বলল, তাই চল। হাঁড়িতে কটা চিংড়ি শুধু লাফাচ্ছে।

দুজনে এসে জামপুকুরে দাম সরিয়ে সরিয়ে কুঁড়োজালি পাততে পাততে দেখল, ও পাড়ার আতাহার পুবপাড়ে ছিপ ফেলছে। সূর্যের কমলা রং তার সাদা ধবধবে গেঞ্জি আর তহবনে লেপটে। একাগ্র হয়ে ছিপের পাখনার দিকে চেয়ে। ফাতনাটা আধখানা ডুবে আছে। একটা লাল ফড়িং বার বার ফাতনায় এসে বসবার চেষ্টা করছে। আতাহার বিরক্ত হয়ে গামছা নেড়ে ফড়িংটাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। নিজেদের পুকুর, বড়োলোক ওরা। ঠিক যেন একটা বক, মাছ শিকার করার জন্য ওত পেতে বসে আছে। তাদের দেখে বলল, দেখিস, পানি গাবাস না। চারে মাছ আছে, পালাবে।

নাজিরা সাবধানে কুঁড়োজালি পেতে দেয় একটা তফাতে। পুকুরটার পশ্চিম উত্তর পাড়ে গোরস্থান। দুই পুকুরের চওড়া পাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা গাঁয়ের ভেতর চলে গেছে। আরও পশ্চিমে শেখেদের বাগান। তারপর বিস্তারী সবুজ ধানের মাঠ। খণ্ড খণ্ড সবুজ গালিচা পাতা। সেদিকে চেয়ে আব্বার কথা মনে পড়ে নাজিরার। আব্বা কবে আসবে আব্বাই জানে।

—এটা তুর ভাই? কী নাম রে তোর? আতাহার শুধোয় নাজিরার বুকের দিকে চেয়ে।

— হ্যাঁ, ওর নাম নাসিরউদ্দিন। নাজিরা সামনেটা ঘোরায় আতাহারের দিক থেকে।

— কী পড়িস? স্কুলে যাস না?

— যাই তো। দু-ক্লাসে পড়ি। নাসির উত্তর দেয়।

— তুই পড়িস না? তুর নাম কী?

নাজিরা ঘাড় নাড়ে না। চুপ করে থাকে। আতাহার নাজিরার উদোম থাই, উরু দেখে, হাতির শুঁড়ের মতো দুই পা। ফ্রকটা গুটিয়ে কোমরে বাঁধা। ভারি পাছা।

—চল নাসু, ওদিকে গে বসিগে।

নাজিরা ভাইকে নিয়ে কুঁড়োজালি ঝাড়তে লাগল। কুঁড়োজালি ঝোড়ে আবার চার দিকে পেতে পেতে দিতে লাগল। এক ঝাড়নেই প্রায় পোয়াটাক কুচোমাছ পাওয়া গেল। ভাইবোন খুব খুশি। নাজিরা মনে মনে বলল, লোকটার নজর খারাপ হলি কী হবে

বেশ পয়া।

আরও দু-ঝাড়ন দিতে প্রায় আধকেজির বেশি মাছ পাওয়া গেল। নাজিরার মনে তখন ভাত খাওয়ার আশা ঝিলিক দিচ্ছে। এই মাছগুলো ভাই নিয়ে গিয়ে পাড়ায় বিক্রি করে চাল আলু কিনে ভাতের জোগাড় করতে পারবে — আজ তারা ভাত খাবে। সারা শরীর মনে নাজিরার আনন্দ কুলকুল করতে লাগল। আনন্দের ঝরনাধারা বইতে লাগল। একটা কুঁড়ো তুলে তাতে হাঁড়ি থেকে সব মাছ ঢেলে বলল, নাসু, এগুতো বাড়ি নিয়ি যেয়ি বিক্রি করি চাল আলু কিনবি, আমরা আজ ভাত খাবু। আমি আর দু-তিন ঝাড়ন দোব। তুকে আসতি হবেনি। আমি একাই যাব।

নাসু খুব খুশি। সে যেতে যেতে বলল, দেরি করিস না যেন। একা থাকবি। তুর ভয় লাগবি না তো বুবু? এই কবরখানায় তুর ভয় করবি না তো?

— না রে, ভয় করব কেনে। ওই দেখ, ও-ও তো আছে।

নাসির চলে গেল। নাজিরা কুঁড়োজালি ঝাড়তে ঝাড়তে আতাহারের কাছাকাছি হতে সাঁই করে একটা আওয়াজ শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাল। দেখল আতাহারের ছিপের বঁড়শিতে একটা মাছ ঝুলছে। বোধহয় শোলমাছ। মাছটা ছিল থেকে ছাড়িয়ে নাজিরাকে বলল, মাছটা তুই নে।

নাজিরার চোখদুটো লোভে চকচক করল। তবু বলল, আপনি নিয়ে যান। সেই বিকাল থেকি বসি আছেন। বাড়িতে রেঁধি খাবেন।

— তুকে প্রথম মাছটা দোব বলে মনে মনে ঠিক করেছি। তুই নে।

আতাহার মাছটা হাঁড়িতে ভরে দিল। বলল, একটা মাছে আমাদের হবে না।

হাঁড়িতে মাছটা খলবল করছে। সূর্য ডুবে গেছে। মাঠ পেরিয়ে আঁধার এগিয়ে আসছে। মাঠের সবুজ কালো হচ্ছে। আতাহার ছিপ ফেলেছে আবার। দৃষ্টি আর ফাতনার দিকে নয়, নাজিরার দিকে।

নাজিরা কুঁড়োজালি ঝাড়তে ঝাড়তে আমগাছটার কাছাকাছি চলে গেল। পুকুরে আরও আঁধার ঘনিয়েছে। নাজিরা কুঁড়োজালি ঝোড়ে পাড়ে উঠতে গিয়েই চমকাল। সাদা গেঞ্জি আর সাদা লুঙি পরা আতাহার। যেন সাদা কাফনে মোড়া মুর্দা। নাজিরার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে রইল।

—হ্যাঁরে, তুই কিছু দেখিস নাই? ওইখানে? আতাহার অদূরের আমগাছটা দেখাল।

— কই, না তো! বিস্মিত ভয়ার্ত নাজিরা ঘাড় নাড়ে।

— ওই দেখ একটা মরা মানুষ। উখানে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

নাজিরা চেয়ে দেখে আবছা আঁধারে একটা নিরাভরণ মানুষ যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে ভয়ে কাঠ হওয়া নাজিরা উঠে এসে আতাহারের নিকটে দাঁড়ায়। আতাহার তার হাত ধরে বলে, ভয় কী রে, আমি আছি তো।

আতাহার তার গায়ে হাত দেয়। নাজিরা দৃঢ় মুঠিতে ধরা হাতটা ছাড়াবার জন্য মোচড়ায়।

— আমাকে ছেড়ে দেন, আমি বাড়ি যাব।

— যাবিই তো। শোলমাছ দিয়ি ভাত খাবি, আর আমাকে কিছু দিবি না।?

হাঁড়িতে শোলমাছ খলবল করে। আতাহারের হাত নাজিরার বুক ছোবলায়। নাজিরা হাত মোচড়ায়। আবার বলে, আপনার পায়ে পড়ি, ছেড়ি দেন। আপনার মাছ আপনি লেন।

— চুপ! বেশি তড়পাস না। নইলে ওই ফুটো কবরে ঢুকিয়ে দোব মেরে। কেউ খোঁজ পাবে না। আমাদের পুকুরে মাছ ধরবি, আবার মাছ দোব, এমনি এমনি।

ভয়ে নাজিরার বুক গুড়গুড় করে। আতাহার তাকে ঠলতে থাকে আমগাছের আঁধারের দিকে। নাজিরার ভাতের স্বপ্নটা তীব্র হয়। আজ ভাই বোন আর মা মিলে ভাত খাবে। পুকুরের পাড়ে বর্ষায় ভেঙে যাওয়া অংশটা পায়ের নীচে। ওপরের মাটি আলগা। আচমকা হাঁচকা টান দেয় নাজিরা। টাল সামলাতে না পেরে পাড় ধসে হুড়মুড় করে পুকুরে পড়ে যায় ওরা। নাজিরার হাত এখন মুক্ত। প্রাণপণ সাঁতরাতে থাকে নাজিরা। আতাহার পায়ে লুঙি জড়িয়ে জবুথবু। নাজিরার যৌবনের দাপটে পুকুর গাবিয়ে ওঠে। কুঁড়োজালি কাঁপে। ও-পাড়ে উঠে নাজিরা হাঁপ ছাড়ে। আতাহার জল থেকে ফুঁসছে। শিকার ছেড়ে গেছে তার।

মাটির হাঁড়িতে বন্দি শোলটা বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে — কিন্তু সে বন্দি, মানুষের ভোগে রসনায় তৃপ্ত হবার জন্য।

শোলমাছটা আবার লাফ দিলে। এবার হাঁড়ির বাইরে। আরেকটু চেষ্টা করলে মাছটা পুকুরের জল পেয়ে যাবে।